## • বিশ্বায়নের অর্থ ও সংজ্ঞা [Meaning and Definition of Globalization]:

বিশ্বায়ন শব্দটিকে এত বিভিন্ন অর্থে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয় যে এদের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ইংরেজি 'গ্লোবালাইজেশন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ। সহজভাবে বললে এর অর্থ বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির বিস্তার, বাণিজ্যের বিস্তার। দেশের বাজার ও বিশ্বের বাজারের মধ্যে কোনো বেড়া না থাকা। সমস্ত বিশ্বটাই যেন একটা বিরাট বাজার। যে দেশ যে জিনিসটা ভলো উৎপাদন করতে পারে (ভারতের ক্ষেত্রে পাট, চা, কাটা হিরে, জামা কাপড়) তা বিদেশে রপ্তানি করে অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়ে সেইসব জিনিস আমদানি করা যা সেই দেশ উৎপাদন করে না (ভারতের ক্ষেত্রে খনিজ তেল, যন্ত্রপাতি)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশেরই স্বনির্ভর হবার প্রয়োজন নেই কারণ সমস্ত পৃথিবীটাই পরস্পর নির্ভরশীল। জোসেফ স্টিগলিৎজ **(Joseph Stiglitz)** বলেছেন "বিশ্বায়ন হল প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় একাত্মতা বা একীভবন। এই একীভবন ঘটেছে প্রধানত দুটি কারণে—(১) পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ব্যয় হ্রাস, এবং (২) এযাবৎ প্রচলিত এক দেশ থেকে আর এক দেশে দ্রব্য, সেবা, পুঁজি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, মনুষ্যসম্পদ প্রভৃতি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাধানিষেধের অন্তর্ধান ("Globalization is the closer integration of the countires and the people of the world which has been brought about by the enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, services, capital, knowledge and people across borders.")। অপর এক লেখক পিটার মার্কাস **(Peter Marcus)**-এর মতে, "বিশ্বায়ন নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এটা হল এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদই, বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিস্তার।" ১৯৭০ সাল থেকে এই পুঁজিবাদী বিস্তারের দুটি বিশেষ দিক লক্ষ করা যাচ্ছে—(১) প্রযুক্তির উন্নতি এবং

*বিশ্বায়নের অর্থ*

(২) ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। পুঁজিবাদের বিস্তারের এই দুটি দিককে একত্রে বিশ্বায়ন বলা হয়েছে। **দীপক নায়ার** (Deepak Nayyer)-এর মতে, বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক মুক্ত পরিবেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতির অঙ্গীভূত দেশগুলির মধ্যে গভীর অর্থনৈতিক সমন্বয়।[৩] যাইহোক, ১৯৭০-এর দশক থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলিকে একযোগে বিশ্বায়ন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

অধ্যাপক **রোল্যান্ড রবার্টসন (Roland Robertson)** বলেছেন যে, 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির ব্যবহার শুরু ১৯৬০, সাল নাগাদ হলেও, শিক্ষার জগতে এর স্বীকৃতি হয় আরও পরে ৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে। **অধ্যাপক রবার্টসনই 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির প্রবর্তক** এবং তিনিই প্রথম একে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন এবং সংজ্ঞায়িত করেন। রবার্টসনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বের সংকোচন (Compression of the World) এবং বিশ্বজোড়া পরস্পর-নির্ভরশীলতা (global inter-dependence)-র অবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বিশ্বায়ন হল পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অবস্থা। **অ্যান্টনি গিডেনস্ (Anthony Giddens)** প্রায় একইভাবে বলেন, 'বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কসমূহের এতটাই নিগূঢ়ীকরণ (intensification of world social relations) যার ফলে পৃথিবীর কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের জীবনধারা শত শত মাইল দূরে সংঘটিত ঘটনাবলির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।"

**অ্যান্টনি ম্যাকগ্রু (Anthony Mcgrew)** প্রায় একইভাবে বলেছেন, বিশ্বায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম রাজনৈতিক গন্ডিকে অতিক্রম করে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে বিশ্বের এক প্রান্তের কোনো ঘটনা, সিদ্ধান্ত বা কাজকর্ম দূরবর্তী অন্যান্য প্রান্তের মানুষ ও সম্প্রদায়ের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে (" ..... a stretching of social, political and economic activities across political frontiers so that events, decisions and activities in one region of the world come to have significance for individuals and communities in distant regions of the globe.")[৪]

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান সহায়ক উপাদান হল **উদারীকরণ**। উদারীকরণ শব্দটির অর্থ হল সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে দূরে রাখা, অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে সমস্তপ্রকার সরকারি বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ দূর করা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনীতি পরিচালিত হবে সরকারি নীতির পরিবর্তে বাজারের কয়েকটি সূচক—মূলত 'দাম' এর দ্বারা। এই নীতির মূলকথা হল—"সবচেয়ে কম কাজকর্ম করে যে সরকার সেই সরকারই সবচেয়ে ভালো।" অর্থাৎ, উদারীকরণ হল বিশ্বায়নের পরিপূরক। উদারীকরণ ব্যতীত বিশ্বায়ন

সম্পূর্ণ হতে পারে না। উদারীকরণের মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে অভ্যন্তরীণ বাজারের মুক্তি ঘটে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, বিশ্বায়ন হল মুক্ত অর্থনীতিরই প্রতিশব্দ। কোনো অর্থনীতির দরজা যখন বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যখন বাণিজ্যিক লেনদেন ও আদান-প্রদানের ওপর কৃত্রিম কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় না, যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধন, শ্রম ইত্যাদির গমনাগমন বাজারি শক্তির স্বাধীন-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা হয়ে থাকে, তখন অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটে। ক্রমে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে উগান্ডার সমাজবিজ্ঞানী ওবান্ডা (B.C. M. W' Obanda) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, বিশ্বায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে বিশ্বের এক অঞ্চলের মানুষ তাদের আদর্শগত, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সাফল্যকে অন্যপ্রান্তে নিয়ে যায় এবং যে অঞ্চলে যায়, সেখানকার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সূচিত করে।[1] অনুরূপভাবে **মার্টিন শ' (Martin Shaw)** বলেছেন, বিশ্বায়ন হল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট এবং পরস্পর সম্পর্কিত এক জটিল সমন্বয়, যার মাধ্যমে একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্ব কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হয়। ওবান্ডা ও মার্টিন শ'— উভয়ের কাছেই বিশ্বায়ন একটি সর্বব্যাপী প্রক্রিয়া। বিশ্বায়নের প্রভাবে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে একীকরণ ঘটেছে তাই নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও বিশ্বজুড়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, **বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিকবাদ এক জিনিস নয়।** আন্তর্জাতিকতাবাদ হল স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ("growing interdependence between state")। আন্তর্জাতিকতাবাদ হল সুস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমানা বিশিষ্ট কতকগুলি জাতীয় এককের পারস্পরিক সম্পর্ক। পক্ষান্তরে বিশ্বায়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বিশ্বায়নের যুগে সময় ও দূরত্বের বাধাকে অতিক্রম করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে সংঘটিত ঘটনার প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে **বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalization) সমার্থক নয়।** বিশ্বায়ন যেখানে দেশ, অঞ্চল তথা মহাদেশের সীমা অতিক্রম করে সারা বিশ্বে জাল বিস্তার করে, আঞ্চলিকতাবাদের কর্মপরিধি সেখানে কতকগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর সংলগ্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে বোঝায়। উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপ—এই তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক ব্লকের মধ্যে বাণিজ্যিক ও আর্থিক আদান-প্রদান হল বিশ্বায়নের এক্তিয়ার; অপরপক্ষে প্রতিটি ব্লকের অন্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্ক হল আঞ্চলিকতাবাদের বিষয়।

## • বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ [Characteristics of Globalization] :

অধ্যাপক রসনু (James Roseneau) তাঁর *Distant Proximities* নামক গ্রন্থে বিশ্বায়নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

**(১) দক্ষতার ক্ষেত্রে বিপ্লব (Skill Revolution) :** বিশ্বায়নের যুগে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নত ঘটেছে, তাকেই বলা হচ্ছে দক্ষতার বিপ্লব। এই বিপ্লব মানুষের কার্যকরী জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করেছে এবং বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়েছে। এই দক্ষতা বৃদ্ধির উৎস হল কম্পিউটার, ইন্টারনেট, দূরদর্শন, টেলিফোন, ফ্যাক্সযন্ত্র প্রভৃতি ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি, যা সময় ও দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে।

**(২) যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব (Communication Revolution) :** বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এক ধরনের বিপ্লব ঘটে গেছে। এই বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান কমেছে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

**(৩) সংগঠনগত বিপ্লব (Organizational Revolution) :** তথ্যপ্রযুক্তি তথা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব বিশ্বের সম-মনস্ক মানুষদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথকে সুগম করেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা আন্দোলনগুলি (যেমন নারীবাদী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, জাতিগোষ্ঠীগত আন্দোলন ইত্যাদি) সংগঠনগতভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পেরেছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে।

**(৪) সচলতার বিপ্লব (Mobility Upheaval) :** বিশ্বায়নের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতিই নয়, মূলধন, শ্রম, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতিও অবাধে জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অবাধে বিচরণ করছে। একেই বলা হচ্ছে সচলতার বিপ্লব।

**(৫) বহুতত্ত্ববাদী কর্তৃত্ব (Plurality of Authority) :** বিশ্বায়নের যুগে যেসব বিশ্বজোড়া অতিজাতীয় সংগঠনের (Trans-national) উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে (যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বহুজাতিক কর্পোরেশন, ন্যাটো, সিয়াটো ইত্যাদি), সেগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেও ভাগ বসাচ্ছে। সহজভাবে বললে, আগে কেবল রাষ্ট্রই ছিল অবিসংবাদিত কর্তৃত্বের অধিকারী, এখন রাষ্ট্র ছাড়াও এইসব সংগঠন যথেষ্ঠ কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এখন ব্যক্তিত্বকে অনেক বেশি সচেতনভাবে স্থির করতে হচ্ছে কার প্রতি কতটা আনুগত্য প্রদর্শন করবে সে। একে আবার অনেক সময় 'কর্তৃত্বের সংকট' (authority crisis)-ও বলা হয়।

**ম্যালকম ওয়াটারস** (Malcom Waters) বিশ্বায়নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির একীকরণ, পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নিগূঢ়ীকরণ এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্ব সাংস্কৃতিক সচেতনতা; (২) বিশ্বজুড়ে ভৌগোলিক সীমানাসমূহের গুরুত্ব হ্রাস; (৩) বিশ্বজুড়ে দূরত্ব ও সময়ের সংকোচন; (৪) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাজার, মানবাধিকার, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের সচেতনতা; (৫) সার্বজনীনতা (Universalism) এবং বিশিষ্টতার (Particularism) মধ্যে ব্যবধান হ্রাস; অর্থাৎ

বিশ্বায়নের যুগে মানুষ একই সঙ্গে নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং মানবতার অংশ হিসাবে ভাবতে শুরু করে। (৬) একদিকে বিদেশি মূলধনকে আহ্বান করা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তৈরি করা। অর্থাৎ বিশ্বায়নের মাধ্যমে একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যদিকে বিপর্যয়—এই দুই বিপরীতমুখী সম্ভাবনার যুগপৎ অবস্থান।

বিশ্বায়নের অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা হল :

(ক) বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ **অমিয়কুমার বাগচি** অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কতকগুলি ক্রম পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। **প্রথম,** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। **দ্বিতীয়,** বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লোকজনের অভিগমন (immigration) ও নির্গমন (migration)। **তৃতীয়,** বিভিন্ন দেশের মধ্যে টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বিনিময় মাধ্যমের সঞ্চালন। **চতুর্থ,** এক দেশের মূলধন অন্য দেশে বিনিয়োগ করে সেখানে শিল্পদ্রব্য, কৃষিজ পণ্য অথবা পরিসেবা উৎপাদন করে সে দেশে বিক্রয়ের প্রবাহ। **পঞ্চম,** এক দেশ থেকে অন্য দেশে লগ্নি পুঁজির আদান-প্রদান। **ষষ্ঠ,** বহুজাতিক অথবা অতিজাতিক (transnational) বাণিজ্য সংস্থাগুলির বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ওপর প্রভাব। **সপ্তম,** বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তির আদান-প্রদান। **অষ্টম,** আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমের বিস্তার এবং বিভিন্ন দেশের তথ্য মাধ্যমের ওপর বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির প্রয়োগ। এছাড়া বেসরকারিকরণের প্রবণতা, মুদ্রাবিনিময় হারে নমনীয়তা, নিয়ন্ত্রণহীন শ্রমবাজার, রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি হল বিশ্বায়নের অপরাপর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। গত শতকের নব্বই-এর দশক থেকে বিশ্বায়নের অর্থ দাঁড়িয়েছে বিশ্ববাজারের চাহিদা মেনে অর্থনীতির উন্মুক্তকরণ যেখানে পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও বিপণনে কোনো বাধা থাকবে না এবং পাশাপাশি পুঁজির চলাচল হবে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। এই বিশ্বপ্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালকের ভূমিকায় থাকবে বহুজাতিক সংস্থাগুলি এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র মতো অধি-রাষ্ট্রিক সংগঠনসমূহ।

(খ) **জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।** বিশ্বায়নের যুগে লগ্নিপুঁজির অবাধ বিচরণ ও লুণ্ঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার নিজেদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রগুলি যেসব আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা গড়ে তুলেছে, সেগুলিও রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অনেকখানি সংকুচিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম ইউরোপে যে ইউরোপীয় সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায় জাতীয় রাষ্ট্রের মতোই ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই সংস্থার অন্তর্গত সমস্ত সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়েছে 'ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট' এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। বলাবাহুল্য এইসব সংস্থা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। শুধু ইউরোপে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এমন সব সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে, যেগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করে, যেমন OAU, ASEAN, OPEC ইত্যাদি। **নজিক, হায়েক, ফ্রিডম্যান, কেনিচি ওমে** প্রমুখ আধুনিক পশ্চিমী উদারনীতিবাদের প্রবক্তাগণ মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্বার্থে সীমিত

রাষ্ট্র (**minimal state**)-এর ধারণায় আস্থাশীল। তবে স্মরণ রাখতে হবে, বিশ্বায়নের আধুনিক প্রবক্তাগণ জাতিরাষ্ট্রের পুরোপুরি বিলোপসাধনের পক্ষপাতী নন। তাঁরা চান রাষ্ট্র তার গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা ও কাঠামো বজায় রাখুক, কারণ গণতন্ত্র ও তথ্যের উন্মুক্ত চলাচল অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রাথমিক শর্ত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংকোচন ছাড়াও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সংকোচন, বামপন্থী আন্দোলন ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রভাব হ্রাস, রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামী ভূমিকার সংকোচন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ হ্রাস ইত্যাদি হল বিশ্বায়নের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।

(গ) বিশ্বায়নের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বের অর্থনৈতিক সংহতিসাধনের নামে **দেশে দেশে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমান্তকে অস্বীকার করা**। বৃহৎ পুঁজির মালিকরা চায় বিশ্বব্যাপী পুঁজির অবাধ চলাচল; তাই তারা রাষ্ট্রীয় সীমানা (border) নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। তাদের যুক্তি হল, বিশ্বব্যাপী বাজারের সম্প্রসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি এবং সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তির সীমাহীন বিস্তার বিশ্বকে আর খণ্ড-ক্ষুদ্র করে না রেখে একটি দুনিয়া জোড়া গ্রাম (global village)-এ পরিণত করতে চাইছে। এই প্রবণতাকে স্বাগত জানিয়ে ভূগোলের প্রাচীর ভেঙে জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বকে প্রকৃত অর্থে একটি অখন্ড এককে পরিণত করতে হবে। এই অখন্ড বিশ্বে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক অভিন্ন আর্থব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তাই **দীপক নায়ার**-এর মতে, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া আসলে মুক্ত বাণিজ্য এবং পণ্য লেনদেনের সীমান্তহীন অঞ্চল গড়ে তোলারই এক প্রক্রিয়া (" ..... a move towards a borderless regime of free trade and tranasaction.")।[1] আর এই বিশ্বায়নের পরিণতিতে অর্থনৈতিক পরিসর ভৌগোলিক পরিসরকে ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হবে।

(ঘ) বিশ্বায়নের সঙ্গে **আর্থিক সুস্থিতিকরণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস** প্রভৃতি বিষয়গুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বায়নের সমর্থকদের মতে উন্নয়নের একটি আবশ্যিক শর্ত হল আর্থিক সুস্থিতি, যা আসবে বিশ্বব্যাপী যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে নয়। এর জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, যার মূল কথা হল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা এবং বাজার অর্থনীতির প্রচলন।

(ঙ) **বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত**। ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ **জন টমিলসন** বলেছেন, বিশ্বায়নের অন্তরে সংস্কৃতির অবস্থান, আবার সংস্কৃতির অন্তরে বিশ্বায়নের অবস্থান ("Globalization is at the heart of modern culture, cultural practices lie at the heart of globalization.")। ইন্টারনেটসহ অত্যাধুনিক গণমাধ্যমগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বায়নের অন্যতম বাহক বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশ্বব্যাপী সমরূপ সংস্কৃতি (homogeneous culture) গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপৃত থাকে এবং এ ব্যাপারে তারা অনেকখানি সফলও হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই বিশ্বায়নের যুগে জাতীয় খাবার, জাতীয় পোশাক, জাতীয় গান-বাজনা বলে কিছু থাকছে না। গায়ে জিন্সের জামা-প্যান্ট,

মুখে ফাস্ট ফুড, হাতে কোল্ড ড্রিংক্স-এর বোতল, কানে মোবাইল এখন পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো অঞ্চলের মানুষের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ব্যাপার। বিশ্বায়নের যুগে সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে এবং এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি (Tele-electronic Culture)-র প্রসার ঘটেছে।

### • বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক [Globalization and International Relations] :

আধুনিক যুগ বিশ্বায়নের যুগ। আজকের দিনে প্রতিটি রাষ্ট্রই বিশ্বায়নের দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত। কোনো দেশ ইচ্ছা করলেও বিশ্বায়নের প্রভাব এড়িয়ে বিচ্ছিন্নভাবে নিজের মতো করে চলতে পারবে না। বিশ্বায়নের উদারমুখী সংস্কার কর্মসূচি প্রায় সকল দেশই অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এইসব সংস্কার কর্মসূচি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থই হল বিশ্বব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কোপের মুখে পড়া। তাই বিশ্বের বহু দেশ, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বাধ্য হয়েই মুক্ত অর্থনীতির পথে হাঁটতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বায়ন বিশ শতকের শেষভাগের একটি আবিষ্কার—এটা ভাবা ঠিক নয়। প্রযুক্তির হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়নের যাত্রা শুরু। তবে অধ্যাপক গৌতম বসুর মতে, সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের ধারা এমন এক সম্পর্কের বেড়াজাল রচনা করেছে, যার গভীরতা, গতিময়তা ও জীবনের বিভিন্ন প্রবণতাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অনেক বেশি। এই অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, পরিবেশগত বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেও নিজস্ব গতিময়তার বাইরে রাখেনি।[1] পৃথিবীর একপ্রান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি দ্রুত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। বিশ্ব-রাজনীতি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে চাইছে। "যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আঞ্চলিক পরিবেশ, সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনীতির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুনভাবে ভাবনার পদ্ধতি ও নতুন ধরনের রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করেছে। ৯/১১-তে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ভেঙে পড়ার দৃশ্য সারা পৃথিবীতে তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ার ফলে এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখার ফলে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীজুড়ে জনমত গড়ে ওঠার ঘটনা বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে এক নতুন ধারণা গড়ে ওঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। একবিংশ শতকের রাজনৈতিক দুনিয়ায় যে কোনো রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকেই মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থিত আঞ্চলিক বা বিশ্বায়িত নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও মূল্যায়নের। স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা, সন্ত্রাসবাদ দমন কোনো কাজই আজ আর কোনো রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নয়।

এখন প্রশ্ন হল এই নতুন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ কি বর্তমানের

অসাম্যভিত্তিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত সংকটাকীর্ণ বিশ্বব্যবস্থার গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারবে? নাকি একটি আর এক ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্যের নিদর্শনে পরিণত হবে? এর উত্তর নিতে হবে আগামী পৃথিবীর কাছ থেকে।

## • বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ [Positive effects of globalization] :

বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিকগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

(১) বিশ্বায়নের সমর্থকদের দাবি, বিশ্বায়নের দরুন রাষ্ট্রের কাজের পরিধি সংকুচিত হলেও তা জনগণের দুরবস্থা বা দুর্ভাবনার কারণ হবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলুপ্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়বে, বিশ্বের সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধু পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলি নয়, তৃতীয় বিশ্বের বেশ কিছু দেশও বিশ্বায়িত অর্থনীতি অনুসরণ করে তাদের আর্থিক অবস্থা আগের থেকে মজবুত করেছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশগুলি আর্থিক সংস্কার কর্মসূচির সুবাদে অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এইসব দেশের শ্রম-দুনিয়া পূর্বেকার জড়ত্ব কাটিয়ে গতিময় হয়ে উঠেছে। এইসব দেশে আগের মতো শ্রমিক অসন্তোষ বা বিক্ষোভ নেই; বাজার অর্থনীতির বিরোধী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝাঁঝ দিন দিন কমে আসছে।

তবে মনে রাখতে হবে এইসব দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোটি তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এইসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং মানব সম্পদেও যথেষ্ট উৎকর্ষমন্ডিত। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়াপত্তন তারা আগেই সম্পন্ন করে রেখেছিল। তাছাড়া এইসব দেশে যে শক্তিশালী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি গড়ে উঠেছিল, সেটি বিশ্বায়নের মূলস্রোতে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। এ ব্যাপারে শ্রমিক সংগঠনগুলির কাছ থেকেও বড়ো রকমের কোনো বাধা আসেনি। এই ধরনের অনুকূল পরিবেশ থাকার জন্যই এইসব দেশের জাতীয় অর্থনীতির ওপর বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মতো সংগঠনগুলির সুপারিশ ক্ষতিকারক কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, বরঞ্চ সমস্ত রকম দুর্বলতা ও জড়ত্ব কাটিয়ে উঠে তাকে গতিশীল করে তুলতে সাহায্য করেছে। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা, রাজস্ব আদায়ে শৃঙ্খল আনয়ন, ভর্তুকি বন্ধ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অলাভজনক সরকারি সংস্থাগুলির রাশটানা, বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস—প্রভৃতি বিশ্বায়িত সংস্কার কর্মসূচিগুলির যথার্থ রূপায়ণের মাধ্যমে এইসব দেশের জাতীয় অর্থনীতি অনেক লাভবান হয়েছে।

(২) নয়া উদারনীতিবাদীদের দাবি, বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বায়ন ব্যক্তি, পরিবার ও কোম্পানির জন্য অধিক সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছে। তথ্য-প্রযুক্তির হাত ধরে উৎপাদন দক্ষতার অভাবনীয় উন্নতি বিশ্বের সমস্ত শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

(৩) বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মানুষকে মানবসমাজের বিভিন্ন

সমস্যার গুরুত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করা সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে, নারীনির্যাতন, শিশু নির্যাতন নিয়ে, মানুষের অধিকার ও মর্যাদার অস্বীকৃতি নিয়ে, বিভিন্ন দেশের দুঃসহ দারিদ্র্য নিয়ে এবং আরও নানা প্রকার মানবিক সমস্যা নিয়ে আজ বিশ্বজুড়ে আলাপ-আলোচনা বিতর্ক চলছে। এটা সম্ভব হচ্ছে বিশ্বায়নের কল্যাণে। বিশ্বায়নের কল্যাণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা আন্দোলনগুলি (যেমন—নারীবাদী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন ইত্যাদি) সংগঠনগতভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পেরেছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হতে পেরেছে।

(৪) বিশ্বায়নের পশ্চিমী সমর্থকগণ দাবি করেন, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (ethnic groups) মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বেড়েছে। এই আদানপ্রদানের ফলে জনগোষ্ঠীগুলি তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই বহুরূপী সংস্কৃতির বিকাশ (Multi-culturalism) মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

(৫) বিশ্বায়নের যুগে একদিকে জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে অমিতশক্তিধর নতুন নতুন অতিজাতীয় (Trans-national) সংগঠনের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটেছে। ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং বহুমুখী কর্তৃত্বের (Plurality of authority) উদ্ভব ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তি এখন উপযোগিতা বিচার করে কোন্ কর্তৃত্বের প্রতি কতটা আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে তা স্থির করতে পারছে।

(৬) পরিশেষে দাবি করা হয়, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব এখন বড়ো ধরনের যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। কারণ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে যেভাবে যুদ্ধের ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অহরহ সতর্ক করা হচ্ছে তাতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে শক্তিশালী বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে।

● **নেতিবাচক প্রভাবসমূহ** : বিশ্বায়নের যেসব ইতিবাচক প্রভাবের কথা বলা হল সেগুলি পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থকদের মত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে ওইসব যুক্তির কোনো সারবত্তা নেই। নীচে বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করা হল :

(ক) **অর্থনৈতিক ক্ষেত্র** : বিশ্বায়নের যদি কিছু ভালো দিক থাকে, তার সবটুকু বিশ্বের ধনী দেশগুলি ভোগ করছে; উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলি বিশ্বায়নের কোনো সুফলই পাচ্ছে না। ফলে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বাণিজ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে মজুরিগত বৈষম্যকে প্রকট করে তুলেছে। উদারীকরণ তথা বিশ্বায়নের সুবাদে মূলধনের সচলতা বাড়লেও সেই তুলনায় শ্রমিকের তথা শ্রমে চলাচল বাড়েনি।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে লগ্নিপুঁজির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের স্বার্থবাহী নীতিগুলি কার্যকর করে যাচ্ছে এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে অবাধে শোষণ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে দরিদ্র

উন্নয়নশীল দেশগুলির লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি বাড়ছে এবং ঘাটতি মেটাতে তারা বিশ্বব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ. প্রভৃতি সংস্থার কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। ঋণের পূর্বশর্ত হিসেবে **কাঠামোগত সংস্কার** (Structural Adjustment) কার্যকর করার কথা বলা হচ্ছে, যার অর্থ হল শিল্পক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ, বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে দেশের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া, দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন, বিনিয়োগ, দাম ইত্যাদির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা, বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। এইসবের যৌথ প্রভাবে দরিদ্র দেশগুলি সর্বস্বান্ত হচ্ছে এবং বহুজাতিক সংস্থা তথা ধনী দেশগুলির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের সৌজন্যে দেশে দেশে বেকারি ও কর্মহীনতার হার ক্রমবর্ধমান। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় বিশ্বই আজ এই সংকটের শিকার। বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেকারি ও কর্মহীনতার হার বেশি বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি দেশে। পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায়, ১৯৯২ সালে ২৪টি শিল্পোন্নত দেশে কাজ-হারানো মানুষের সংখ্যা যেখানে ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯৯৮ সালে তা বেড়ে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ-এ দাঁড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। গত শতকের নব্বই-এর দশকের শেষে এইসব দেশে বেকার ছিল ১২ কোটি। সম্প্রতি সংখ্যাটি অনেক বেড়ে গেছে। এছাড়া অনুন্নত দেশের মানুষের মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের হার কমছে, কমছে ক্যালোরির পরিমাণ ও বাড়ছে নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের সংখ্যা। সুতরাং এসব দেশে বিশ্বায়ন হল ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিশ্বায়ন।

**(খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্র :** বিশ্বায়নের ফলে জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। লগ্নিপুঁজির অবাধ বিচরণ ও লুণ্ঠনকে নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা জাতিপুঞ্জের সার্বভৌমত্বকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাছাড়া বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় শরিক হতে গিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর সরকারি ভরতুকি প্রত্যাহার করতে হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য পরিসেবামূলক কার্যে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ ঘটাতে হয়েছে; এক কথায় রাষ্ট্র এখন জনসেবামূলক বা কল্যাণকর ভূমিকা ত্যাগ করে পাহারাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। **নজিক, হায়েক, ফ্রিডম্যান** প্রমুখ আধুনিক পশ্চিমী উদারনীতিবাদের প্রবক্তাগণ মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্বার্থে সীমিত রাষ্ট্রের (Minimal State) ধারণায় আস্থাশীল। বিশ্বায়নের যুগে যেসব আন্তঃসরকারি সংগঠন এবং অতিজাতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেগুলিই বিশ্বপরিস্থিতির সমস্ত কলকাঠি নাড়ছে। এইসব সংগঠনের কাজকর্মে জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ভূমিকা খুবই অকিঞ্চিৎকর। বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য হল একটি সমসত্তাবিশিষ্ট **বিশ্ব সমাজ (global society)** গড়ে তোলা; এরজন্য প্রথমেই দরকার পড়ছে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত সীমাকে অতিক্রম করা। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বায়নের প্রভাবে ভূখণ্ডীয়তা (territoriality) এবং সার্বভৌমিকতা (sovereignty)—রাষ্ট্রের এই দুটি প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বায়নের যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। তবে মনে রাখতে হবে, বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে

পরিবর্তন ঘটলেও, জাতি-রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। সবশেষে মনে রাখতে হবে বিশ্বায়নের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ পশ্চিমের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির ওপর নজিরবিহীন আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে।

**(গ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র :** বিশ্বায়নের হাত থেকে সাংস্কৃতির ক্ষেত্রটিও রেহাই পায়নি। বিশ্বায়নের যুগে সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে এবং এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি (Tele-electronic culture) বিশ্বজুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। বলাবাহুল্য এই নতুন সংস্কৃতি পশ্চিমী ভোগবাদী সংস্কৃতির অত্যাধুনিক সংস্করণ এবং এর প্রভাবে বিশ্বের গরিব দেশগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ **জন টমিলসন** বলেছেন, বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'বিশ্বায়নের অন্তরে সংস্কৃতির অবস্থান, আবার সংস্কৃতির অন্তরে বিশ্বায়নের অবস্থান'। বস্তুত এই বিশ্বায়নের যুগে জাতীয় খাবার, জাতীয় পোশাক বলে কিছু থাকছে না। গায়ে জিন্সের জামা-প্যান্ট, হাতে কোল্ড ড্রিংস-এর বোতল, কানে মোবাইল, মুখে ফাস্ট ফুড এখন পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো অঞ্চলের মানুষের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ব্যাপার। উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলি বাণিজ্যের স্বার্থে নিজেদের ভোগবাদী সংস্কৃতিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। টিভি, সিনেমা এবং অন্যান্য আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে যৌনতা ও হিংসাকে তারা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (basic instinct) বলে তুলে ধরছে। টিভি-র পর্দায় উত্তেজক ফ্যাশন-শো প্রদর্শনী, নারীর সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার এবং আরও বিভিন্নভাবে তারা একটা বিকৃত সংস্কৃতিকে আদর্শ সংস্কৃতি হিসেবে তুলে ধরছে এবং কিশোর-কিশোরীদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে তুলছে। এই বিশ্বায়িত সংস্কৃতির পরিমন্ডলে মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে উন্নত ভোগ-সুখের লালসায় বিশ্বজনীন সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং এইভাবে তার স্বাধীন চেতনাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

**(ঘ) পরিবেশগত ক্ষেত্র :** পরিবেশগত দিক থেকেও বিশ্বায়নের প্রভাব যথেষ্ট নেতিবাচক। এই বিশ্বায়নের যুগে যেভাবে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ইত্যাদির প্রসার ঘটেছে তাতে বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশ যথেষ্টরূপে দূষিত হয়ে উঠেছে। অনেকেরই আশঙ্কা, এইভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ব আর মানুষের বাসযোগ্য থাকবে না।

**(ঙ) অন্যান্য :** বিশ্বায়নের আরও অনেক নেতিবাচক দিক আছে। যেমন, ধরা যাক **সন্ত্রাসবাদ**-এর কথা। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নতুন কিছু বিষয় নয়। তবে বিশ্বায়নের আগে এই ধরনের কার্যকলাপ সাধারণত কেনো বিশেষ অঞ্চলে বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। বিশ্বায়নের যুগের উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এদের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতাও আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বরে মার্কিন মুলুকে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের ঘটনা এ ব্যাপারে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সন্ত্রাসবাদের ন্যায় বিভিন্ন **মারাত্মক রোগও** আজ জাতীয় বা আঞ্চলিক

সীমা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, এডস্ রোগের কথা উল্লেখ করা যায়। শুরুতে এই রোগ কিছু বন্দর এলাকাতে সীমিত ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে এটি খুব দ্রুত একটি আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়েছে।

**মানবমুক্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিশ্বায়ন ব্যর্থ হয়েছে।** ২০০০-২০০১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদনে (Human Development Report) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বায়নজনিত পরিস্থিতিতে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, জ্ঞানের বিস্তার অথবা আর্থিক সংহতির প্রসার ঘটলেও বিশ্বজুড়ে মানবিক অধিকারগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৬ সালে World Development Report-এর মুখবন্ধে বিশ্বব্যাঙ্ক-এর সভাপতি পল ওলফোউৎজ (Paul. D. Wolfowitz) বলেছেন, 'আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে দেশের ভেতর ও বাইরে সুযোগসুবিধার বৈষম্য অস্বাভাবিকভাবে প্রবল, এমনকি ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও বিসদৃশভাবে বন্টিত (disparately distributed)'। UNDP (United Nations Development Programme) কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৫ সালের মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদনে প্রায় একই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্বায়নের ফলস্বরূপ প্রযুক্তিবিদ্যা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে লক্ষণীয় অগ্রগতি হলেও, মানবিক উন্নয়নের হার অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক।

বিশ্বায়নের এই নেতিবাচক দিকটি যত বেশি করে প্রকট হচ্ছে, ততই এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষ। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিয়াটল সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ৫০ হাজার মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ২০০১ সালের জুলাই-এ ইটালির জেনোয়া শহরে অনুষ্ঠিত G-৪-এর সভা চলাকালে বিশ্বায়ন বিরোধী জমায়েতের ওপর পুলিশ আক্রমণ চালায় এবং কার্লো গিউলিয়ানি নামক এক তরতাজা যুবককে গুলি করে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ কয়েকটি বিশ্বায়ন বিরোধী মঞ্চ গড়ে ওঠে, যেমন—'জেনোয়া সোস্যাল ফোরাম,' 'ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সোসাইটি', 'ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম' ইত্যাদি। নতুন শতকে অর্থনীতির বিশ্বায়নের বিপরীতে ঘটে চলেছে প্রতিবাদের বিশ্বায়ন, যাকে কেউ কেউ 'চেতনার বিশ্বায়ন' বলেছেন।

**উপসংহার :** উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বায়নের কিছু ইতিবাচক দিক আছে ঠিকই, কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাবই বেশি। তাছাড়া এর যেটুকু ভালোর দিক আছে তার সিংহভাগই ভোগ করছে বিশ্বের ধনী দেশগুলি তাদের সুবিধাজনক অর্থনৈতিক অবস্থানের জোরে। আর গরিব দেশগুলি ক্রমশই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে, দেশের অর্থনীতিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। যোশেফ স্টিগলিৎজ-এর মতো পশ্চিমী অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেছেন, বিশ্বায়ন পৃথিবীর অধিকাংশ

গরিবদের জন্য কিছু করছে না ("Globalization is not working for many of the world's poor.")। তবে ইতিহাসের চাকাকে তো পিছন দিকে ঘোরানো যায় না। ভালো হোক খারাপ হোক, বিশ্বায়ন আজকের দিনে একটি বাস্তব ঘটনা। সুতরাং, বিশ্বায়নকে বর্জনের কথা না বলে কী করে একে মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করা যায় এবং বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করাই শ্রেয়। জগদীশ ভগবতী তাঁর *In Defence of Globalization (2004)* গ্রন্থে বলেছেন, দারিদ্র্য, শিশু শ্রমিক ও মহিলাদের ক্রমবর্ধমান শোষণ ইত্যাদির জন্য একমাত্র বিশ্বায়ন দায়ী নয়; নীতির পরিবর্তন সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নগামিতা আনতেই পারে। কিন্তু এর জন্য আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ না করে কীভবে এবং কত তাড়াতাড়ি সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায় তার অন্বেষণ করা দরকার। তাঁর ভাষায়, সম্ভাব্য নিম্নগামিতা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আধুনিক কলকারখানার বিস্তার ও আধুনিকীকরণ বন্ধ করা হলে সেটা হবে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা ("You do not shut off the expansion and modernization of modern mills and factories to handle this potential downside. To do that would be like cutting off your nose to handle an occasional nasal dip.")।[*1]

## • ভারতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা [Introduction of the process of globalization in India] :

*সূচনা*

ভারতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় মোটামুটিভাবে বিশ শতকের ৮০-এর দশক থেকে। ওই সময় থেকেই ভারতে বিদেশি মূলধনকে স্বাগত জানানো হয়, বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করা হয়, আমদানি-রপ্তানি নীতিকে উদার করা হয়, ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করা হয়, ফেরা আইনের (Foreign Exchange Regulation Act) কঠোরতা হ্রাস করা হয়। এরপর ১৯৯১ সালে আর্থিক কর্মসূচি গ্রহণ করার সময় থেকে ভারত পুরোপুরি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার শামিল হয়ে যায়।

*বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার কারণ*

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভারতের যুক্ত হওয়ার পিছনে দুটি উপাদান কাজ করেছে—একটি হল দেশের প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অপরটি হল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (IMF) ও বিশ্বব্যাঙ্ক-এর চাপ। ১৯৮১-৮২ সালের পর থেকে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় বেড়ে যায়, অথচ রপ্তানি থেকে আয় কমে যায়। যার ফলে ভারত ওই সময় অস্বাভাবিক বাণিজ্য ঘাটতির কবলে পড়ে। সপ্তম যোজনাকালে বেসরকারি উৎস থেকে বিদেশি আয়ের আগমন কমতে থাকে। দেশ প্রচন্ড বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের মধ্যে পড়ে। ১৯৯০-৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। এই সংকট থেকে মুক্তির জন্য ভারতকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক-এর কাছে ঋণের জন্য হাত পাততে হয়। এদের কাছ থেকে ঋণ পেতে হলে কিছু শর্ত পূরণ

করতে হয়। যেমন, মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস করা, অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার (Structural Adjustment), উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বহির্বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি। এইসব শর্ত মানার অর্থই হল দেশের অর্থনীতিকে বিদেশের কাছে হাট করে খুলে দেওয়া, অর্থনীতির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা এবং বিশ্বায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া। বলাবাহুল্য ১৯৯০-৯১ সালের আর্থিক পরিস্থিতি ভারতকে আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক-এর শর্ত মানতে বাধ্য করে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে ভারত সরকার ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে একগুচ্ছ **সংস্কার** কর্মসূচি প্রণয়ন করে, যেমন—

(১) শিল্পনীতিকে আরও উদার করে শিল্পের বেসরকারিকরণ ঘটানো;

(২) লাইসেন্স ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকে আহ্বান করা;

(৩) আমদানি-রপ্তানি নীতি আরও উদার করা;

(৪) ডলারের অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো;

(৫) IMF এবং বিশ্বব্যাঙ্ক-এর কাছ থেকে প্রচুর ঋণ নিয়ে বিদেশি মুদ্রা তহবিল বাড়িয়ে অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো; এবং

(৬) ঋণের শর্ত মতো দেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত সংস্কারসাধন করা।

এই সমস্ত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৯১-এর পরবর্তী বছরগুলিতে ভারত সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। যেমন—আমদানি শুল্ক ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটে আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ হার ৪০ শতাংশে ধার্য করা হয় এবং ইস্পাত, ইলেকট্রনিক্স, টেলিযোগাযোগ, যন্ত্রপাতিসহ বেশ কিছু পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হয়। উদার শর্তে বিদেশি ও অনাবাসী ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য আহ্বান করা হয়। বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভারতে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়া হয়। একবিংশ শতকে বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন NDA সরকার উদারীকরণ ও বিলগ্নীকরণ নীতির আর একদফা অগ্রসর ঘটিয়েছিল। এই পর্বে বেশ কিছু লাভজনক সরকারি সংস্থাকেও বিলগ্নীকৃত করা হয়। তৎপরবর্তী মনমোহন সিং পরিচালিত UPA সরকার পূর্ববর্তী সরকারের পথ অনুসরণ করে আর্থিক সংস্কারের গতি অব্যাহত রেখেছে।

*উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ*

### • ভারতীয় অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব [Impact of globalization on Indian Economy] :

ভারতীয় অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব একমুখী নয়। অর্থাৎ, ভারতীয় অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়নের যেমন নেতিবাচক প্রভাব আছে, তেমনি কিছু ইতিবাচক প্রভাবও আছে।

**বিশ্বায়নের সুফল :** বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার শুরু এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব সুফল পাওয়া গিয়েছে বলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) প্রথমেই দাবি করা হয় ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) বিনিময় হার নমনীয় করার ফলে ভারতের মোট রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে।

(৩) বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে আমদানি বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশি দ্রব্যের প্রভাবে ভারতীয় অর্থনীতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। আমদানি বেড়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে রপ্তানির পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮০-র দশকে আমদানির ৬০ শতাংশ ব্যয় মেটানো সম্ভব হতো রপ্তানির সাহায্যে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে আমদানির ৯০ শতাংশ মেটানো যাচ্ছে রপ্তানির সাহায্যে। তাই দেশের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করা হয়।

(৪) টাকার পূর্ণ রূপান্তর যোগ্যতার সূচনা সত্ত্বেও টাকার বিনিময় হার যথেষ্ট স্থিতিশীল আছে।

(৫) সংকটের সময় ভারতের বৈদেশিক ঋণ প্রতি বছর ৪ বিলিয়ান ডলার করে বাড়ছিল। ১৯৯৩-৯৪-তে বৈদেশিক ঋণের বৃদ্ধি ১ বিলিয়ন ডলারের কম ছিল। পরের বছরগুলিতে ওই ঋণের পরিমাণ আরও কমে যায়।

(৬) ভারতে বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতীয় অর্থনীতির ব্যাপারে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে এসেছে।

(৭) বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতে লেনদেন ব্যালেন্সেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

● **বিশ্বায়নের কুফল ঃ** সমালোচকেরা বিশ্বায়নের যেসব কুফলের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা হল :

(১) সমালোচকদের মতে, ১৯৯১ সালের পর থেকে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বেড়েছে সত্য, কিন্তু এই বর্ধিত তহবিলের একটা বড়ো অংশ বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। যদি অনুমান মতো রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় না বাড়ে, তাহলে এই ঋণ শোধ করা বা ঋণের সুদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ঋণ মেটাতে পুনরায় নতুন ঋণ নিতে হবে এবং এইভাবে **দেশ ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে।**

(২) বিশ্বায়নের সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিকটি হল **দেশের অর্থনীতিতে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির অবাধ প্রবেশ।** এরা অচিরেই ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে গ্রাস করবে এবং অর্থনীতির মূল স্তম্ভগুলিকে দখল করে বসবে। ফলে ভারত শুধু তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারাবে তাই নয়, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে।

(৩) বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতের মাথাপিছু আয় কমেছে এবং আয়জনিত বৈষম্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে। UNDP (United Nations Development Programme)-এর পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ২০০১ সালে যেখানে পৃথিবীর সব দেশ মিলিয়ে গড় মাথাপিছু উৎপাদন মূল্য ছিল ৬১৩৩ ডলার, ভারতের সেখানে ছিল মাত্র ৪৬২ ডলার যা দক্ষিণ আফ্রিকা (২৬২০ ডলার) ও মেক্সিকো (৬২১৪ ডলার)-র থেকেও কম; এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় মাথাপিছু উৎপাদনের (১২৭০ ডলার) থেকেও অনেকটা কম।

(৪) শক্তিশালী বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে ভারতের দেশীয় শিল্প সংস্থাগুলি ভীষণভাবে মার খাচ্ছে এবং এর প্রত্যক্ষ বলি হচ্ছে দেশের শ্রমিককুল। দেশীয় শিল্পসংস্থাগুলির দুরবস্থার ফলে কাজ হারিয়েছে হাজার হাজার দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে প্রাপ্ত হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের মোট ৬৬ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছে ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক। ১৯৯৭ সালের পর থেকে শিল্পে মন্দার গতি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং রপ্তানির হার কমেছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে আমদানি-রপ্তানি খাতে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪০৫.৬ কোটি ডলার, ১৯৯৮-৯৯তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২৪১.৬ কোটি ডলার।

(৫) বিশ্বায়নের অশুভ প্রভাব থেকে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রটিও রেহাই পায়নি। রাসায়নিক সার, সেচের জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ওপর নতুন নিয়ম অনুযায়ী ভর্তুকি তুলে দেওয়ার ফলে এবং শস্যবীজ, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি সরবরাহে রাষ্ট্রের উদ্যোগ ক্রমশ কমিয়ে আনার ফলে দেশের কৃষকসমাজ বিশেষ করে প্রান্তিক চাষিরা ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আবার অন্যদিকে বিশ্বায়নের ফলে বাইরের দেশের খাদ্যশস্য অবাধে এদেশে ঢুকে পড়ার জন্য উৎপন্ন ফসলের মূল্য হ্রাস ঘটছে। ফলস্বরূপ কৃষকরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে এবং আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের আলুচাষি, অন্ধ্রের তুলাচাষি, মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ উৎপাদক, উত্তরপ্রদেশের আখচাষি প্রভৃতির দুর্দশার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা তাদের একমাত্র সম্বল জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে দেশীয় পুঁজিপতি এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বার্থে। বাস্তুজমি অধিগ্রহণ করে বিশাল বিশাল জলাধার নির্মাণের ফলেও নানাস্থানে কৃষিজীবীরা চরম সর্বনাশের মুখোমুখি হচ্ছে। সরকারি ভর্তুকি কমে যাওয়ায় কেরোসিন, চিনি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী গ্রামের গরিব মানুষদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। ফলে বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ ক্যালরির দরকার তা তারা জোগাতে পারছে না। এককথায় কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত গ্রামের গরিব মানুষের কাছে বিশ্বায়ন হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত স্বরূপ।

(৬) **ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রেও অবস্থাটি ভয়াবহ।** বিশ্বায়নের আগে নিয়ম ছিল, ওষুধ শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বিদেশি সংস্থা ৪৯ শতাংশের বেশি শেয়ার রাখতে পারবে না। ওষুধ ভারতেই তৈরি করতে হতো এবং দাম নির্ধারণে সরকারের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। বিশ্বায়নের ফলে নিয়মকানুনের কঠোরতা হ্রাস করতে হয়েছে। বিদেশি কোম্পানিগুলি এদেশে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে, বাইরে থেকে ওষুধ আমদানি করছে। ফলে বিদেশি ওষুধের দাম বাড়ছে এবং চিকিৎসার সুযোগ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

(৭) সবশেষে মনে রাখতে হবে, শিল্পোন্নত দেশগুলি আমদানি, রপ্তানি, বাজার ইত্যাদির বিশ্বায়নের পক্ষে জোরালো সওয়াল করছে, কিন্তু প্রযুক্তির বিশ্বায়ন নিয়ে তারা একটি কথাও বলছে না। আধুনিক প্রযুক্তিকে তারা নিজেদের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যেই রেখে দিয়েছে। আর এই শক্তিশালী হাতিয়ারটির সাহায্যে ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশগুলিকে

সর্বস্বান্ত করতে চাইছে। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পৃথিবীর মোট পেটেন্টের ৯৫.৩ শতাংশের মালিক ১০টি শিল্পোন্নত দেশ।

**উপসংহার :** আজকের দিনে বিশ্বায়ন একটি বাস্তব সত্য। একে অস্বীকার করা কোনো দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীর যে-কোনো দেশের ন্যায় ভারতকেও স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে। তবে কখনই তা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নয়। বিশ্বায়নকে দেশের স্বার্থের অনকূলে ব্যবহার করে নিতে হবে। চিন, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি বিশ্বায়নকে জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছে বলেই তাদের উন্নয়ন ব্যাহত হয়নি।